115

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা আজ কোন্ পথে?

শাহিখ সিরাজ

১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যালয় পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে কর্মমুখী কৃষিপ্রযুক্তি হাতেকলমে শিক্ষা দেয়া, যাতে তারা সমাজের দায় হওয়ার পরিবর্তে কারিগরি জনশক্তিতে পরিণত হয়। এর আগেও নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিজ্ঞান নামে ঐচ্ছিকভাবে কৃষি শিক্ষা চালু ছিল এবং তা তত্ত্বীয় পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সেক্ষেত্রে বর্তমানে কৃষি শিক্ষাকে "বাধ্যতামূলক" করা সরকারের একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষায় বর্তমানে তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিকভাবে সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ৪০ নম্বর দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে—যার ফলে এখন শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক দু'টি অংশেই পাস করতে হবে। কৃষি শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচীতে ফসল উৎপাদন, হাঁস-মুরগির চাষ, পশুপালন, মৎস্য চাষ ও বনায়ন নামে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের ব্যবহারিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রত্যেক স্কুল প্রাঙ্গণে সমন্বিত খামার ও কৃষি পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে হবে। এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ। কৃষিপ্রধান এই দেশে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই। আমাদের দুর্ভাগ্য তা হয়নি। এখন যাও বা হলো তাও পূর্ব পরিকল্পনাহীন। ফলে শুরুতেই বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা ভেস্তে যেতে বসেছে।

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন অন্য দশটি বিষয়ের মতো কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঘোষণা হওয়া উচিত নয়। এখানে জাতির ভবিষ্যত আশা-ভরসার সাথে শিক্ষিত জনশক্তি তথা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হওয়ার প্রশ্ন জড়িত। অথচ এক্ষেত্রেও আমরা একে পুতুল খেলার মতো ভাবছি। বলা নেই, কওয়া নেই, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রশ্ন নেই, ইচ্ছা হলো নতুন একটি বিষয় চালু করে দিলাম! এত সহজে পৃথিবীতে কোন জাতি শিক্ষিত হতে পেরেছে বলে জানা নেই। কারণ শিক্ষার কোন শর্ট-কাট ব্যবস্থা নেই।

বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষার পাঁচটি বিষয়ে স্কুল পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে খামার মডেল স্থাপন করতে হবে— অর্থাৎ গরুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার, মাছের খামার, সবজি বাগান, নার্সারি এবং পরীক্ষাগার ভবন— যেখানে এসে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ শিখবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই খামার মডেল বাংলাদেশের মতো দরিদ্র একটি দেশের সব ক'টি স্কুলে স্থাপন করা সম্ভব কি না! কোন সন্দেহ না রেখেই উত্তর হচ্ছে— না। কারণ প্রথমত বিষয়টি অত্যন্ত ব্যয়বহুল, দ্বিতীয়ত স্কুলের অবস্থান এবং নিজস্ব সম্পদের অপ্রতুলতা, তৃতীয়ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব, চতুর্থত স্কুল প্রাঙ্গণে খামার স্থাপনের প্রয়োজনীয় স্থানের অপ্রাপ্যতা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সারা দেশে জরিপ চালিয়ে নিম্ন ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোর সামর্থ্য-সুবিধা ও জমির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। এগুলো হচ্ছে—শহর সচ্ছল, শহর মধ্যম, শহর প্রান্তিক, পল্লী মধ্যম ও পল্লী প্রান্তিক বিদ্যালয়। পল্লী মধ্যম বিদ্যালয়ের ধরন হচ্ছে থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে অবস্থিত বিদ্যালয়; যেখানে শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। তবে স্কুল প্রাঙ্গণে জমি থাকতে পারে। এমন একটি স্কুলের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার আলোকে দেশের অযোগ্য সব স্কুলে খামার মডেল ও কৃষি পরীক্ষাগার স্থাপন করা সম্ভব বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ধারণা করছে। সেই হিসাবেই ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে গোয়ালন্দ জেলার থানা সদরের একটি পল্লী মধ্যম বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষার খামার মডেল স্থাপন করা হয়। যে মডেলটি পরবর্তীকালে দেশের অন্য সব স্কুল অনুসরণ করবে। দুর্ভাগ্য দু'মাস পরে গিয়ে মডেল খামারের সবজি বাগান ছাড়া অন্য বিষয়ের খামারগুলোর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষায় যেহেতু গোটা দেশের মধ্যে এই স্কুলটিতেই সরকারীভাবে সর্বপ্রথম খামার মডেল স্থাপন করা হয়, তাই উদ্বোধনী দিনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই নতুন এই শিক্ষাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দু'মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের সাথে আবার বিষয়টি নিয়ে আলাপ করা হলে, খামার মডেল স্থাপন এবং কৃষি শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের অন্তরায় কিংবা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলো তাঁরা নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম হন। স্কুলের হেড মাস্টার মন্তব্য করেন, এই শিক্ষাক্রম চালু রাখতে হলে পর্যাপ্ত ফান্ডের প্রয়োজন, যা আমাদের নেই এবং খামার টিকিয়ে রাখার জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজন, তাও আমাদের নেই। কৃষি শিক্ষক মন্তব্য করেন, আমি মূলত কৃষি শিক্ষক নই, স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক। আমাকে এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কৃষির পাঁচটি বিষয়ে। আমি নিজেই কিছু বুঝিনি, ছাত্রদের বোঝাব কি?

আর কয়েকজন শিক্ষার্থী বলল, আমরা নেপিয়ার ঘাসের চাষ করেছি, এটি খুব ভাল সবজি। এর পরেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, হবে হবে, শুরুতে এমনই হয়। আসলে কথাটা ঠিক নয়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের চিহ্নিত করে সমস্যাগুলোর আলোকেই নতুন করে প্রণীত হওয়া উচিত বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষাক্রমের নতুন পরিকল্পনা—যা হবে ভবিষ্যতের জন্যে টেকসই শিক্ষাসূচী—নইলে এ শিক্ষার শিক্ষিত দক্ষজনই আপনাকে গরুর খাদ্য নেপিয়ার ঘাস সবজি হিসাবে খাওয়াবে!